পাক্ষিক

আলিয়া

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর একটি উদ্যোগ

আমাদের কথা

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদের মুখপত্র সাহিত্য পত্রিকা ত্রৈমাসিক আলিয়া ইতিমধ্যে মাসিক রূপ নিয়েছে। এবং তারপরে পাক্ষিক আলিয়া-র আয়োজন! পথ চলাটা একটু বেশি রকমের দ্রুত ও ঝুঁকি বহুল হয়ে যাচ্ছে হয়তো। তবু আমরা আলিয়া-পরিবার এই নতুন রূপে আত্মপ্রকাশের ব্যাপারে দ্বিধাহীন। আসলে এক একটা সময় আসে যখন ঝুঁকি নিতেই হয়। এখন তেমনি এক সময়কে অতিক্রম করছি আমরা। কোভিড-১৯ অনেক কিছু শিখিয়েছে; বদলে দিয়েছে অনেক হিসাব নিকাশ। আমাদের সামাজিক সম্পর্কের সমীকরণটি যেমন।

বহুকালাবধি সাম্প্রদায়িকতা রূপ সত্যের দহনে দগ্ধ হচ্ছিলাম আমরা। মাঝে মধ্যে এই দহন তীব্র মাত্রা নিচ্ছিল। তবু তারই মধ্যে নিজেদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সমস্যা হচ্ছিল না। তখন কেবলই মনে হত, মেঘ সরে গিয়ে নতুন করে সূর্য ওঠা শুধু সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু সেই মনে হওয়াটা আজ কিছুতেই অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হচ্ছে না। অস্বাভাবিক এক যন্ত্রণা আমাদের চেতনাকে গ্রাস করেছে। করোনার সংক্রমণ ও নিজামুদ্দিন এর তাবলিগ জমাত কেন্দ্রিক যে সমীকরণ প্রস্তুত করা হয়েছে তার বিষক্রিয়ায় পুরোপুরি নীল হয়ে গেছি আমরা। এটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না যে, বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একটা শ্রেণি যখন এই নোংরা খেলাটা খেলে চলেছে, তখন সমাজের বৃহত্তর শ্রেণি, এতকাল যাঁদেরকে গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছি তাঁরা এমন আশ্চর্যরকমভাবে নির্বিকার থাকতে পারেন! পত্র-পত্রিকায় দুই-একটি উত্তর সম্পাদকীয় রচনা এবং সোস্যাল মিডিয়ায় সামান্য আহা উহু করা ব্যতিরেক এই বিরাট অন্যায়ের প্রেক্ষিতে সর্বজনশ্রদ্ধেয় বুদ্ধিজীবী সমাজ আর কিছু করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। কিন্তু কেন? একটি বন্য পশু ট্রেনের চাকায় পিষ্ঠ হলেও যাঁদের মানবিকতাবোধ উথলে ওঠে তাঁরা মানবতার এমন দুঃসহ অবমাননার প্রেক্ষিতে কী করে সম্পূর্ণ নিরুত্তাপ থাকেন!

মনের আকাশ জুড়ে আজ সন্দেহের কালো মেঘ। তা হলে কি সবটাই মুখ ও মুখোশের খেলা! এই অমানবিকতা, এই কদর্যতাই কি তা হলে অনস্বীকার্য সত্য! হয়তো তাই; তবু কেবলই মনে হয়, মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ। তাই অবিশ্বাসের দীপকে ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে আরও একবার নতুন করে যাত্রা শুরু করা গেলো। আমাদের কেবলই মনে হচ্ছে, এই যে অমানবিকতার উচ্চকিত উচ্ছ্বাস, এর মূলে রয়েছে একটা বিরাট ভুল। আর সে ভুলের সিংহভাগ দায় মুসলমান সমাজের। ভারতীয় মুসলমান সমাজ নিজেদেরকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলেনি। তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার যৎসামান্য। সংস্কৃতির চর্চা আরও কম। মুসলমান সমাজের এই পশ্চাৎপদতার কারণে পরিস্থিতি আজ এত জটিল রূপ নিয়েছে। আজ যদি তাদের হাতে উপযুক্ত প্রচার মাধ্যম থাকতো; যদি তারা নিজেদের কথাটা নিজেদের মতো করে বলতে পারতো, তা হলে চিত্রটা কমবেশি অন্যরকম হতো। অন্তত আগ্রহী ব্যক্তিবর্গ তাদের কথাটা শুনে, বুঝে নিজেদের মতো করে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ পেতেন। এভাবে একমুখী প্রচারের ঝোড়ো হাওয়ায় সবকিছু ভেসে যেত না। সমস্যা আজ যে রূপ নিয়েছে তাতে দেশ ও দশের স্বার্থে সংবাদ মাধ্যম, টিভি চ্যানেল সহ সোস্যাল মিডিয়ায় মুসলমান সমাজের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর বিকল্প নেই। পাক্ষিক আলিয়া অবশ্যই সেই বিকল্প নয়। একে বিকল্পের বিকল্প বলে বিবেচনা করা যেতে পারে।

উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে আমাদের মনে হয়েছে, অন্য অনেক বিষয়ে এই মুহূর্তে বিশেষ কিছু করা না গেলেও একটা কাজ অপেক্ষাকৃত সহজে সম্পন্ন করা যেতে পারে। মুসলমান সমাজের আত্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রটিকে যথাসম্ভব উর্বর করা। নিরবচ্ছিন্ন বিরুদ্ধ প্রচারের চাপে মুসলিম যুবসমাজ এখন নিজেদের উপর নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে। তারা অন্যদের অন্যায় অভিযোগ বা অত্যাচারের বিপরীতে কোনো প্রতিরোধ রচনা করতে না পেরে নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর আস্থাহীন বা উদাসীন হয়ে পড়ছে। এ এক বিরাট বিনষ্টি। এমন বিনষ্টি থেকে আত্মরক্ষা করতে চাইছি আমরা। আমাদের লক্ষ্য, একাধারে একজন আদর্শ ভারতীয়-বাঙালি-মুসলিম নাগরিক হিসাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য উদীয়মান প্রজন্মকে প্রয়োজনীয় সব বিষয়ে প্রাথমিকপাঠ দেওয়া। আপাতত ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি, বাঙালি জাতি-সংস্কৃতির ইতিবৃত্ত, ঐশ্লামিক সংস্কৃতি, মানব সভ্যতার ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে এই পাঠক্ষেত্রকে প্রসারিত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

আমাদের স্থির বিশ্বাস, দেশ ও জাতি আজ যে গভীর সংকটের মুখোমুখি সেখান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মুসলিম সমাজের স্বমহিমায় ভাস্বর হয়ে ওঠার বিকল্প নেই। এ নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, আমাদের মধ্যে আজও এমন কিছু কিছু মানুষ রয়েছেন যাঁরা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে লাঞ্ছিত মুসলিম সমাজের পাশে দাঁড়িয়ে যথাসাধ্য করছেন। কিন্তু তারপরেও তাঁরা বিশেষ সুবিধা করতে পারছেন না। আসলে অনুগ্রহের জল অধিক দূর পর্যন্ত গড়ায় না। জাতীয় সংহতির স্বার্থে মুসলিম সমাজকে এখন তাই নতুন চেতনায় উদ্ভাসিত হতেই হবে। পাক্ষিক আলিয়া-র লক্ষ্য এই নবচেতনার মূলে যথাসম্ভব জলসেচন করা।

বিশেষ নিবেদন

পাক্ষিক আলিয়া ইংরেজি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। সুধীজনদের থেকে পাঠ নেওয়া, লেখা দেওয়া সহ সম্ভাব্য সব রকমের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

যোগাযোগ : সাইফুল্লা, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭ গোরাচাঁদ রোড। কলকাতা-১৪; aliahsanskriti@gmail.com, ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯ (হোয়াটস্‌অ্যাপ)

* পাক্ষিক আলিয়া—আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র নয়

কবি হাস্‌সান-বৃত্তান্ত থেকে শিক্ষা নিতে হবে আমাদের

কাওসারুজ্জামান

ইসলামের ইতিহাসের একেবারে প্রথম দিকের ঘটনা। আমাদের নবীজী তখন জোর কদমে ইসলাম প্রচার করছেন এবং তাঁর সাফল্যে চূড়ান্তভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে সেদিনের অমুসলিম সমাজ। তারা তখন শারীরিক নির্যাতনের ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা করতে না পেরে বেছে নিয়েছে বিকল্প পথ। আরবীয়রা বরাবরই কবিতা রচনায় অত্যন্ত দড়। তাদের রচিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক কবিতার দহন জ্বালা সহ্য করা মোটেই সহজ নয়। অবস্থার প্রেক্ষিতে তারা নবী (স.) কে লক্ষ্য করে তাদের কবিতার অস্ত্রে শান দিল। রচিত হলো একটার পর একটা কবিতা। এসব কবিতায় এত তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করা হলো, যে নবীজীর মতো পরম সহিষ্ণু মানুষের পক্ষেও তা অসহ্য হয়ে উঠলো। অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের প্রিয় নবী প্রত্যাশা করলেন, তাঁর অনুগামীদের পক্ষ থেকে উক্ত কবিতা সমূহের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দেওয়া হোক। কিন্তু মুসলমান সমাজে তখনো তেমন কোনো প্রতিভাধর কবির দেখা নেই। এমন অবস্থায় সকলেই যখন খুব অসহায় বোধ করছেন তখন আল্লাহতালার উপর ভরসা করে এগিয়ে এলেন কবি হাস্‌সান; হাস্‌সান বীন সাবিত। নবীর আকাঙ্ক্ষা অনুসারে উল্লেখিত সব কবিতার প্রত্যুত্তরে কবিতা রচনা শুরু করলেন তিনি এবং অচিরেই সে সব কবিতা মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে পৌঁছে গেল বিরুদ্ধ শিবিরে। এতদিন তারা একপক্ষভাবে কবিতার আগুনে দগ্ধ করছিলেন আমাদের প্রিয় নবীকে; এবার তাদের গায়েও জ্বালা চড়লো।

অতঃপর নবী অত্যন্ত প্রীত হলেন কবি হাস্‌সানের উপর। মসজিদ-নব্‌বিতে নামাজ চলাকালে নবীজীর ডান দিকে নির্দিষ্ট করা হলো তাঁর আসন। নবীর নিত্য সহচরদের দলেও অন্তর্ভুক্ত হলেন তিনি। এক যুদ্ধযাত্রা কালে নবীজী হাস্‌সানকে বললেন--'এই বিশ্বাসঘাতক ...দের দুষ্কৃতি ও বিশ্বাসঘাতকতা বর্ণনা করিয়া কবিতা রচনা করো; ফেরেস্তা জিব্রাইল (আ.) তোমার সাহায্যে আছেন।' এই প্রসঙ্গে আর একটি বৃত্তান্তের কথা স্মরণ করতেই হয়। মা আয়েষার সাপেক্ষে কবি কবি হাস্‌সান একদা এক বিশেষ অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও মা আয়েষা কবিকে কোনোরকম তিরস্কার না করে বা শাস্তি না দিয়ে তাঁর প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল থাকেন। সাহাবারা এই বৈপরীত্যের কারণ জানতে চাইলে আয়েষা বলেন, কবি হাস্‌সান সেদিন যেভাবে নবীর সম্মান রক্ষা করেছিলেন সেকথা স্মরণ করে আমি তার অন্য অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছি। বোখারী শরীফের ২৩৪৬, ২৩৪৮ সংখ্যক হাদিস সহ অন্যত্র কবি হাস্‌সান কেন্দ্রিক বৃত্তান্তের বিবরণ আছে।

কবি হাস্‌সান এর এই ইতিবৃত্ত আজ আমাদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুসলিম সমাজ এখনও পর্যন্ত লড়াই বলতে অস্ত্রের ঝনঝনানির অতিরিক্ত আর কিছু আছে বলে ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না। তাই সেইমতো সাধ্যানুসারে নিজেদের প্রস্তুত রাখার চেষ্টা করে এবং বাকিটা আল্লাহতালার উপর ছেড়ে দেয়। সাংস্কৃতিক সংগ্রাম এবং সে সংগ্রামের প্রেক্ষিতে নিজেদেরকে উপযুক্ত উপাদানে সুসজ্জিত করার বিষয়টি আমাদের চেতন মনে অদ্যাবধি কোনোরকম ছায়াপাত করতে পারছে না। এদিকে গোটা পৃথিবী জুড়ে এখন সাংস্কৃতিক সংগ্রামই মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের দেশও সেখানে মোটেই পিছিয়ে নেই। কোভিড ১৯ এর সংক্রমণ ও নিজামুদ্দিন বৃত্তান্ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কাকে বলে। দেশের ক্ষমতাসীন দলের অন্যতম রাজনৈতিক এজেন্ডা এখানকার মুসলমান সমাজকে খলনায়ক হিসাবে প্রতিপন্ন করা। বল প্রয়োগের পথে এমন এজেন্ডাকে কখনো বাস্তবায়িত করা চলে না। তাই বিকল্প পথ অবলম্বন করেছে তারা এবং অসামান্য রূপে সফল হয়েছে।

বর্তমানে অমুসলিম ভারতবাসীর একটা বিরাট অংশ মনে প্রাণে মুসলমানদেরকে ঘৃণা করতে শুরু করছে। এদিকে এই ঘৃণার আগুনে অসহায়ভাবে নিজেদের সমর্পণ করার অতিরিক্ত আর কিছুই মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। এমন অসহায়তা কিন্তু আমাদের জন্য অনিবার্য ছিল না। আমরা যদি ইসলামকে তার সত্য স্বরূপে উপলব্ধি করতে পারতাম, নবীর আদর্শকে করতাম শিরোধার্য, তবে আজ অবশ্যই ঘটনার গতিমুখ বদলে দেওয়া যেতে পারতো। টিভি চ্যানেলগুলি থেকে শুরু করে দেশের অধিকাংশ প্রচার মাধ্যম যখন একযোগে মুসলমান সমাজকে ধুয়ে দিচ্ছে তখন যদি তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো উপযুক্ত প্রচার মাধ্যম আমাদের হাতে থাকতো তবে পরিস্থিতি অন্যরকম হতে বাধ্য ছিল। এন ডি টিভি, কলকাতা টিভি-র মতো যা দুই একটি চ্যানেল কিছুটা সদর্থক ভূমিকা নিয়েছিল তার শুভ ফল ফলেছে অনেকটাই। মনে রাখতে হবে, এই যে টিভি চ্যানেলগুলি মুসলমানদের, অন্যঅর্থে সত্যের পক্ষে দাঁড়িয়ে দুটো কথা বললো তার কোনোটির নেপথ্যে মুসলিমদের কোনোরকম পৃষ্ঠপোষকতা নেই। মুসলমানদের পক্ষ থেকে আর্থিক বা অন্য কোনোভাবে এইসব চ্যানেলের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়নি এবং এর পরেও সম্ভবত দেওয়া হবে না।

বৈষয়িকতা চিরকালীন সত্য, এখনকার বাজার অর্থনীতির যুগে তা আরও বেশি করে সত্য হয়ে উঠেছে। এই যে অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম নির্জলা মিথ্যাকে নির্ভেজাল ভাবে পরিবেশন করে গেল, এর নেপথ্যে বিরাট কোনো বৈষয়িক বৃত্তান্ত আছে বলেই মনে হয়। এমন বৈষয়িকতাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এন ডি টিভি বা কলকাতার টি ভি-র পক্ষে আগামী দিনে নিজস্ব অবস্থানে দৃঢ় থাকতে না পারা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এটা তখনই স্বাভাবিক হবে যদি মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে বিকল্প বৈষয়িক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়। বলা বাহুল্য তেমন কোনো দৃষ্টান্ত তৈরি করার জন্য আমরা এখনও মানসিকভাবে মোটেই প্রস্তুত নই। আমরা এরপরেও পাঁচবার বা দশবার ওমরা করে কিংবা বিশ বা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয় সহযোগে এলাকায় আরও একটি সুদৃশ্য মসজিদ তৈরি করে ইসলামকে জেন্দা রাখার চেষ্টা করে যাব। আমরা একবার ভেবে দেখারও চেষ্টা করবো না, নিজেদের ব্যবস্থাপনায় একটি টি ভি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করার কথা, নিদেন পক্ষে সমাজের পক্ষ নিয়ে যে সব ছেলেরা ইউ টিউব চ্যানেল ও ওই জাতীয় কিছু পরিচালনা করছে তাদের দিকে আর্থিক সহায়তা সহ সম্ভাব্য সবরকম সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার বিষয়টি।

সর্বশক্তিমান আল্লাহতালার দোস্ত নবী মুহম্মদ (স.) কে বিরুদ্ধ পক্ষের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কবি ও কবিতার আশ্রয় নিতে হয়েছিল; বিশ্বাসঘাতকদের অপকীর্তি কীর্তন করে কবিতা রচনা করার প্রেক্ষিতে কবি হাস্‌সানকে সহযোগিতা করার জন্য স্বয়ং জিব্রাইল (আ.) নিযুক্ত করেছিলেন তাঁর প্রভু। এদিকে আমরা বিধর্মীদের আক্রমণের বিপরীতে আরও বেশি করে নামাজ পড়া বা ওই জাতীয় নফল এবাদতের বাইরে আর কিছুই করে উঠতে পারছি না। এই অপারকতার বহরকে প্রসারিত হতে দিয়ে আমরা যে প্রকারান্তরে মহান আল্লাহতালা ও তাঁর প্রিয় নবীকে অসম্মানিত করছি, যতদিন আমাদের মধ্যে এই বোধের জাগরণ না ঘটবে এবং সেই অনুসারে আমরা ক্রিয়াশীল না হবো ততদিন আল্লাহতালাহ আমাদের প্রতি সদয় হবেন না; বিধর্মীদের হাতে আমাদের অপদস্থ হওয়ার পরিসীমা আরও প্রসারিত হতেই থাকবে।

নজরুলের জাতীয়তাবাদী উচ্চারণের অনন্যতা

সামিম মল্লিক

অপ্রিয়, কিন্তু অনস্বীকার্য সত্য যে, বাংলা সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতা রূপ অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় নিরপেক্ষ কোনো সত্য নয়। সাম্প্রদায়িকতার পোষাক গায়ে চড়িয়েই দশম শতাব্দী নাগাদ শুরু হয়েছিল বাংলা সাহিত্যের পথ চলা। অতঃপর অতিক্রান্ত হয়েছে কমবেশি সহস্র বৎসর। এই দীর্ঘ কালপর্বে আমরা বাঙালিরা বাংলা সাহিত্যের শরীর থেকে সাম্প্রদায়িতার আবরণ খুলে নিয়ে তাকে নিছক বাঙালিত্বের রঙে রঞ্জিত করতে পারেনি। বাঙালি জাতি সত্তা যেমন বৌদ্ধ, ইসলাম, হিন্দু এসব ধর্ম-সম্প্রদায়ের সমন্বিত রূপ, বাংলা সাহিত্যেও তেমনি তার প্রতিবিম্বন সুস্পষ্ট। প্রাগাধুনিক যুগের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল, আধুনিক যুগে পা রাখার পরেও বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের সৃষ্টি ক্ষেত্রে সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে বাঙালির জাতীয় চেতনাকে সেভাবে প্রকট করে তুলতে পারেননি। ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের রচনা সমূহ আক্ষরিক অর্থেই সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট। যাঁরা এভাবে সরাসরি সাম্প্রদায়িকতার ফাঁসে ফেঁসে যাননি তাঁরাও সর্বোপরি আত্মরক্ষা করতে পারেননি এর দহন থেকে। আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও নন।

কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রবীন্দ্র-সাহিত্যের যে অঙ্গনেই কান পাতা হোক না কেন কোনো ক্ষেত্র থেকেই তেমনভাবে জাতীয়তাবাদী সুরের অনুরণন অনুভূত হয় না; একমাত্র ব্যতিক্রম গোরা উপন্যাস। এই একটি মাত্র রাবীন্দ্রিক সৃষ্টি যেখানে জাতীয়বাদের স্ফুরণ স্বতঃস্ফূর্ত। আমরা জাতীয়তাবাদী সাহিত্য বলতে সেই সাহিত্যকে বিবেচনা করি যেখানে স্রষ্টা যে কোনো ধরনের ভেদবুদ্ধিকে যথাসম্ভব আড়াল করে অখণ্ড জাতীয়চেতনাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেন। গোরা উপন্যাসের গোরা এই জাতীয়চেতনার নিশানকে বহন করেছে দক্ষতার সাথে। এখন প্রশ্ন, বিরাট বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে তো বটেই, রবীন্দ্রনাথের মতো মুক্তমনের মানুষের রচনা ধারাতেও জাতীয়তাবাদী উচ্চারণের এত অপ্রতুলতা কেন। জিজ্ঞাসাটির ভর ও ভার অবশ্যই সামান্য নয়। এই ভর-ভারকে আর্থ-সামাজিক সাংস্কৃতিক ইতিহাসের গভীরে স্থাপন করে অনুসন্ধান করতে হবে এর সম্ভাব্য উত্তর।

বৌদ্ধধর্ম সম্প্রদায়ের কথা যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলে বাঙালি জাতিসত্তার প্রধান গঠনগত উপাদান হিসাবে অবশিষ্ট থাকে মুসলমান ও হিন্দু, দুই ধর্ম সম্প্রদায়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, এই দুই ধর্ম-সম্প্রদায় গত প্রায় এক হাজার বছর পাশাপাশি অবস্থান করলেও এদের মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশার ক্ষেত্রটা সেভাবে প্রসারিত হয়নি। ফলত দুই ধর্ম সংস্কৃতির সংমিশ্রণে অখণ্ড জাতীয় সংস্কৃতির ধারণা খুব প্রতিষ্ঠা পায়নি। আর তারই নেতিবাচক প্রতিবিম্বন লক্ষ করা গেছে সাহিত্যের অঙ্গনে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, মীর মশাররফ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র এঁরা কেউই অতিক্রম করতে পারেননি সময়ের সীমাবদ্ধতাকে। এঁদের সৃষ্ট সাহিত্যের একটা দিক সম্প্রসারিত হয়েছে দেশ-কাল-পাত্র নিরপেক্ষভাবে মানবিকতার পথ ধরে; অন্যদিকে রয়েছে জাতি-সম্প্রদায় সাপেক্ষ জীবনভাষ্য। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যক্ষেত্রে জাতি-সম্প্রদায় সাপেক্ষ জীবনভাষ্যের উদ্ভাসন এমনিতে অস্বাভাবিক কিছু নয়, বরং সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পাশাপাশি এও মনে রাখার যে, সাহিত্যক্ষেত্রে জাতি-সম্প্রদায় নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী শৈল্পিক উচ্চারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিশেষত বাঙালি সমাজ ও বাংলা সাহিত্যের মতো ক্ষেত্রে।

নানা কারণে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয়ী জাতীয় চেতনা বাঙালির জাতীয় জীবনে যেভাবে দানা বাঁধেনি; এতে যে সমস্যা তৈরি হয়েছে তার অনেকটা নিরসন হতে পারতো যদি আমাদের কবি-সাহিত্যিকরা তাঁদের অসামান্য প্রতিভাবলে সময়ের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে এমন সব কবিতা, গল্প, উপন্যাস বা নাটক লিখতেন যেখানে আমাদের হিন্দু বা মুসলমান রূপ লেজটা খসে গিয়ে বাঙালিত্বের পরিচয়টা এক ও অদ্বিতীয় হয়ে উঠতো। সেক্ষেত্রে ওই সব সাহিত্যের দ্বারা প্রাণিত হতে পারতো আমাদের নতুন প্রজন্ম। দুর্ভাগ্য যে, গোরার একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে প্রাক্ নজরুল পর্বের বাঙালি কবি-সাহিত্যিকরা এক্ষেত্রে মোটেই সুবিধা করতে পারেননি। আর এখানেই নজরুলের অনন্যতা।

কবি নজরুল সাহিত্যচর্চা করতে বসে কেবল একাধারে ইসলামি গজল ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেননি, তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টির অঙ্গন জুড়ে হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত সংস্কৃতির স্রোত বয়ে গেছে। এমন হাজারও কবিতা রয়েছে যেখানে একইসঙ্গে হিন্দু পুরাণ ও ঐশ্লামিক পুরাণ হাত ধরাধরি করে রয়েছে। নজরুলের কবিতা পড়তে পড়তে মুসলমান বা হিন্দু যে কোনো সমাজের পাঠক তার নিজস্ব ধর্ম-সংস্কৃতির গভীরে অবগাহন করতে পারেন অনায়াসে। আর এখানেই বড় সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে রবীন্দ্রনাথ সহ অপরাপর স্রষ্টার সৃষ্টি। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় পা রেখে একজন মুসলিম সেভাবে কোনো মানসিক আশ্রয় খুঁজে পান না; তার সমাজ সংস্কৃতির কথা এখানে নেই বললেই চলে। উল্টে প্রতিকূল স্রোতে ভেসে আসা নানা বিষয়ের পীড়নে ক্লান্ত; স্থানে স্থানে রীতিমতো ধ্বস্ত হতে হয় তাকে। সমকালীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবন ও চরিত্রের নেতিবাচক উপস্থাপনের যেমন শেষ নেই তেমনি কোথাও তেমন কোনো ইতিবাচক উপস্থাপন নেই। প্রাক্ নজরুল পর্বের বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন ব্যতীত আর কেউই মুসলমান জীবনকে সেভাবে মেলে ধরতে পারেননি। ফলত সমস্যা হয়েছে। মুসলমান সমাজ যেমন আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি, অমুসলমান সমাজ তেমনি বাংলা সাহিত্যের আশ্রয়ে তাদের প্রতিবেশী সমাজকে সেভাবে চিনে নেওয়ার সুযোগ পায়নি। এতে সমস্যার গভীরতা বেড়েছে।

একটা কাব্য, উপন্যাস বা নাটক কোনো জাতি-সংস্কৃতির সংগঠনে কী গভীর ছাপ রাখতে পারে আনন্দমঠ এর দৃষ্টান্ত থেকে তা সহজেই বুঝে নেওয়া যায়। আজ বাঙালির জাতীয় জীবনে সাম্প্রদায়িকতার যে বাড়বাড়ন্ত তার নেপথ্যে এই বঙ্কিমী-সৃষ্টির ভূমিকা অপরিসীম। আনন্দমঠ-এ যে জীবনবোধকে লালন করা হয়েছে তারই ফলিত রূপ আজকের হিন্দু জাতীয়তাবাদ। উনিশ শতকের সাত আটের দশকে ব্রাহ্ম ভাব-আন্দোলনের দীপ নিভে যাওয়ার প্রেক্ষিতে আনন্দমঠ, রাজসিংহ প্রভৃতির উষ্ণস্পর্শে পুষ্ট হিন্দু জাতীয়তাবাদের চূড়ান্ত পরিণতি ছেচল্লিশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও সাতচল্লিশের দেশভাগ। যদি বঙ্কিমী জীবনবোধ কিংবা আনন্দমঠ, রাজসিংহ প্রভৃতির ছত্রছায়ায় সেদিন হিন্দু জাতীয়তাবাদ এভাবে পুষ্ট না হতো তবে বাঙালির জাতীয় ইতিহাস অন্যরকম করে রচিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না। উত্তর পলাশির যুদ্ধপর্বে বাঙালির যে রক্তাক্ত জীবন-বাস্তবতা তার দায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যকাররা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেন না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশ্নে তাঁদের নিস্পৃহ; স্থানে স্থানে চরম নেতিবাচক ভূমিকার দুর্বহ ভার বইতে বইতে আমরা এখন ক্লান্ত, মূহ্যমান।

ধর্ম-সম্প্রদায় নিরপেক্ষ বাঙালি জাতি-সংস্কৃতির সংগঠন ও তার লালন-পালনে বাঙালি কবি-সাহিত্যিকদের এই সীমাহীন ব্যর্থতার বিপরীতে অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হলেন কবি নজরুল। তিনিই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম ও অদ্যাবধি অপ্রতিদ্বন্দ্বী জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিক; তিনি কেবল বিদ্রোহী কবি নন; তিনি বাংলার কবি, বাঙালির কবি।

ভারতবর্ষ ও বৌদ্ধ সমাজ-বৃত্তান্ত

সাদিকুর রহমান

বর্তমানে পৃথিবীতে যতগুলি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের প্রচলন রয়েছে বৌদ্ধধর্ম তার মধ্যে অন্যতম। মায়ানমার, জাপান, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি এমন অনেক দেশ রয়েছে যেখানে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যা গরিষ্ঠ। সংখ্যাগত দিক থেকে বৌদ্ধরা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম-সম্প্রদায়। খ্রিস্টান ও মুসলমানদের পরেই এদের অবস্থান। এমন গুরুত্বপূর্ণ যে বৌদ্ধ তাদের ক্ষেত্রে একটা বিষয় অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তি স্থল ভারতবর্ষ; অথচ ভারতভূমিতে বৌদ্ধদের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। একশো ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এক কোটিও বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী নয়।

ইতিহাসে এমন ঘটনার দৃষ্টান্ত একেবারে নেই তা বলা যাবে না। উৎপত্তি স্থলে কোনো কোনো ধর্ম সত্যিই সেভাবে প্রচার প্রসার পায়নি। তবে বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে সে কথাটা অবশ্য খাটে না। উৎপত্তির অব্যবহিত পরে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার প্রসার হয়েছিল। একটা সময়ে ভারতভূমি বৌদ্ধময় হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধ সম্রাট অশোকের ইতিবৃত্ত আমাদের সকলেরই কমবেশি জানা। সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের পতাকা হাতে নিয়ে শুধু ভারতীয়দের হৃদয় জয় করেননি, পার্শ্ববর্তী সব দেশের, বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাধারণ মানুষের হৃদয় লুঠ করে নিয়েছিলেন। থাইল্যান্ড, মায়ানমার, জাপান ইত্যাদি দেশে অদ্যাবধি যে বৌদ্ধ-প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তার নেপথ্যে সম্রাট অশোকের ভূমিকা অনেকখানি বলে মনে হয়।

সমকালে যারা ভারতভূমির অধিশ্বর হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই সম্রাট অশোকের মতো বৌদ্ধ-ধর্মাশ্রয়ী ছিলেন। অপরাপর ভারত ভূখণ্ডের মতো বঙ্গদেশেও একদা বৌদ্ধ-প্রাধান্য বর্তমান ছিল। অধিকাংশ প্রাজ্ঞজনের মতে, দীর্ঘদিন সাফল্যের সঙ্গে বঙ্গদেশ শাসন করা পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ। বলা হয়, পালযুগে বাঙালিদের মধ্যে অধিকাংশজন বৌদ্ধধর্মাদর্শ অনুসরণ করতো। সে যাই হোক, আমাদের প্রশ্ন, একদা এই ভারত ভূমিতে যে বৌদ্ধদের এত প্রাধান্য ছিল এখন তাদেরকে দূরবিন দিয়ে দর্শন করতে হয় কেন! সেই দিনের সেই সব বৌদ্ধরা আজ কোথায় গেল! কোথায় গেল তাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির নিদর্শন সমূহ। কেন ভারতে বৌদ্ধ স্থাপত্যের তেমন কোনো নিদর্শন চোখে পড়ে না। আফগানিস্থানের বামিয়ানে যেখানে বৌদ্ধরা পাহাড়ের গায়ে পাথর কেটে কেটে বুদ্ধের মূর্তি খোদাই করেছিল সেখানে মূল ভারতভূমিতে তারা তাদের ধর্ম-পুরুষের অমন অনিন্দ্যসুন্দর সব মূর্তি প্রস্তুত করেনি; এও কী সম্ভব!

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একটা সময় পর্যন্ত গোটা ভারতভূমি জুড়ে বৌদ্ধ সংস্কৃতির অপ্রতিহত প্রাধান্য ছিল। নালন্দার মতো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৌদ্ধ-ভারতে। ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে, যখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা নানা মত পথে বিভক্ত হয়ে ভিতর থেকে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তখন প্রবল প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু সমাজের ব্যবস্থাপনায় সে বিশ্ববিদ্যালয় সহ বৌদ্ধ-ভারতের অপরাপর স্থাপত্য ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করা হয়েছিল নিঃশেষে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়কে এমনভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাতে তার চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট না থাকে। ''...বৌদ্ধধর্মকে পরাভূত করিয়া হিন্দুরা যেভাবে বৌদ্ধ-ইতিহাস লোপ করিয়াছিলেন, তাহা অকথ্য অত্যাচার-লাঞ্ছিত।...যে পূর্ব্ব -ভারত বৌদ্ধধর্মের প্রধান লীলাক্ষেত্র ছিল, তথায় বৌদ্ধধর্মের যে অস্তিত্ব ছিল, তাহাও য়ুরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণের চেষ্টায় অধুনা আবিষ্কার করিতে হইয়াছে।...হিন্দুরা বৌদ্ধাধিকারের সমস্ত চিহ্ন ইতিহাস হইতে লুপ্ত করিয়াছিলেন।'' (দীনেশচন্দ্র সেন, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের অবদান) এ তো গেল, স্থাপত্যের দিক। উল্টোদিক থেকে সেদিন যে পথে বৌদ্ধ ভারতবাসীকে নিধন করা হয়েছিল তার বীভৎসতা সুস্থচিত্তে বর্ণনার যোগ্য নয়।

কথিত আছে, সেদিন হাজার হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর মস্তক কর্তন করে সেইসব কর্তিত মস্তককে বিশালাকার তেলের কড়াই এ রেখে ভাজা হয়েছিল-- ''শঙ্কর-বিজয়ে' উল্লিখিত আছে—রাজা সুধন্বা অসংখ্য জৈন ও বৌদ্ধ পণ্ডিতের মস্তক উলুখলে নিক্ষেপ করিয়া ঘোটনদণ্ডে নিষ্পেষণ পূর্ব্বক তাহাদের দুষ্টমত চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়াছিলেন।' (দীনেশচন্দ্র সেন, ওই) বঙ্গদেশের রাজা শশাঙ্ক বোধহয় বৌদ্ধনিধন যজ্ঞে স্বর্ণপদক লাভ করার জন্য দৃঢ় চিত্ত হয়েছিলেন । তিনি তাঁর হিন্দু প্রজাদের উদ্দেশ্যে ফর্মান জারি করেছিলেন, হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত সর্বত্র নারী পুরুষ নির্বিশেষে বৌদ্ধদের দেখা মাত্র নিধন করতে হবে; বলা হয়েছিল, যে এই নির্দেশ পালন করতে অনীহা প্রকাশ করবে তার মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে--'কথিত আছে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্কের আদেশ ছিল—সেতুবন্ধ হইতে হিমগিরি পর্য্যন্ত যত বৌদ্ধ আছে—বালক-বৃদ্ধ নির্ব্বিশেষে তাহাদিগকে হত্যা করিবে, যে না করিবে তাহার মৃত্যুদণ্ড হইবে।' (দীনেশচন্দ্র সেন, ওই) প্রাজ্ঞ সমালোচকের মতে, এখন 'হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আমরা যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা লক্ষ্য করিতেছি, তাহার গুরুত্ব কিছুই নাই। বৈদিক যুগের যুদ্ধাদি এবং পরবর্ত্তী যুগে হিন্দু-জৈন-বৌদ্ধের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সঙ্গে তুলনা করিলে, এখনকার এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা ষট্প্রকোষ্ঠ রাইফেলের গুলির কাছে পট্‌কার আগুনের মতো নগণ্য।' (দীনেশচন্দ্র সেন, ওই)

সেদিন প্রবল অত্যাচারের মুখে দাঁড়িয়ে বৌদ্ধ সমাজের একাংশ নতুন করে হিন্দুধর্মে দীক্ষা নিয়ে কোনোক্রমে প্রাণ বাঁচিয়েছিল; অন্যেরা হয় মৃত্যুর কোলে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল, নয় দেশ ত্যাগ করেছিল। বাংলা ভাষার প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ যে তীব্বত থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল তার নেপথ্যে রয়েছে এই দেশত্যাগের বৃত্তান্ত। সেদিনের হিন্দু কুলপতিরা যেভাবে বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞ সম্পন্ন করেছিলেন পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত অবশ্যই সুলভ নয়। তাদের এই বিরল কৃতির নিরিখে ভারতেতিহাসের সাপেক্ষে কিছু গুরুতর প্রশ্ন আমাদের চেতন মনের আঙিনায় উৎকটভাবে ছায়াপাত করে। হিন্দুদের অত্যাচারের প্রাবল্যে যদি ভারতভূমিতে বৌদ্ধ সমাজ নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে গিয়ে থাকে তবে মুসলমানদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের পাথার সন্তরণ করে ভারতবর্ষ জুড়ে হিন্দু সমাজ বহাল তবিয়তে টিকে থাকে কী ভাবে! বিশেষত দিল্লি বা আগ্রার মতো শহরে কী করে অদ্যাবধি অমুসলিম সমাজের প্রাধান্য বর্তমান থাকতে পারে; কীভাবে ভারতবর্ষে জুড়ে অগণিত গগনচুম্বি সব মন্দির দাঁড়িয়ে থাকে মাথা উঁচু করে! মনে রাখতে হবে কোনো শাসকই ধোয়া তুলসি পাতা হন না, মুসলমান শাসকরা নিশ্চয়ই কম বেশি অত্যাচার করেছিলেন। কিন্তু সে অত্যাচারের বহর যদি ততদূর পর্যন্ত প্রসারিত হতো তবে আজকে ভারতবর্ষে হিন্দু সমাজের অবস্থা বৌদ্ধসমাজের অনুরূপ হতো না কী! বলা যেতে পারে, সেদিন যদি মুসলমান শাসকরা অত্যন্ত মুক্তমনের পরিচয় না দিতেন তবে আজকে যারা মুসলিমদের বিরুদ্ধে এত অভিযোগ করছেন তারা হয়তো তার অবকাশ পেতেন না।

ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল

মইনুল হাসান

ব্যারিস্টার আব্দুল রসুলকে আজ ক'জনই-বা মনে রেখেছেন! পূর্বভারত তথা অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশে উদার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন, মুক্তমনা ও আজীবন সংগ্রামী আব্দুল রসুল শ্রীঅরবিন্দ ও রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুগামী ছিলেন। ১৮৭৪ সালের ১০ এপ্রিল তাঁর জন্ম; বাংলার তৎকালীন কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবেড়িয়া এলাকার এক প্রত্যন্ত গ্রামে। স্মরণ করা যেতে পারে, এই এলাকাতেই পরে জন্ম হয় আর এক বিশ্বখ্যাত মানুষ কবি আল মাহমুদ-এর।

রসুলের গ্রামের নাম গুনিয়াউক; তাঁর বাল্য নাম কাচন মিঞা। বাবা ছিলেন এলাকার স্বনামধন্য জমিদার। অল্প বয়সে স্বামীর মৃত্যু হলে পর্দানসীন স্ত্রী লংজান বিবি দক্ষতার সঙ্গে জমিদারি পরিচালনা ও ছেলের দেখ্‌ভাল করেন। লংজান বিবি ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জের অভিজাত পরিবারের কন্যা।

আব্দুল রসুল প্রথমাবধি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। তিনি ১৮৮৮ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলেতে যান এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্ট জোন্‌স কলেজ থেকে ১৮৯৮ সালে এম এ ডিগ্রি প্রাপ্ত হন; পাশাপাশি ব্যারিস্টার হন মিডল টেম্পল থেকে। পরে ব্যাচেলর অফ সিভিল ল' ডিগ্রিও লাভ করেন। উপমহাদেশের বাঙালিদের মধ্যে তিনিই প্রথম এই ডিগ্রি প্রাপ্ত হন। অপরাপর ডিগ্রি লাভের পর আই সি এস-এর জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। কিন্তু অপটু শরীর ও বয়স কম হওয়ায় এই প্রয়াস সফল হয়নি। আব্দুল রসুল ছিলেন বহু ভাষাবিদ। তিনি বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি, উর্দু, ফরাসি, জার্মান ও ফ্রেঞ্চ জানতেন।

১৮৯৮ সালের ৩১ আগস্ট রসুল দেশে ফিরে আসেন। ফিরে আসার আগে ওদেশের একটি মেয়েকে বিয়ে করেন। ইংলন্ড ও ওয়েলস্-এ তাঁর নাম নথিভুক্ত থাকলেও সেখানে আইন ব্যবসা না করে কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যবহারজীবী হিসাবে যাত্রা শুরু করেন ৫ ডিসেম্বর ১৮৯৮ এ। ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। এই কারণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে এন্ট্রান্স পরীক্ষার ইংরাজি বিষয়ে প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত করে। আন্তর্জাতিক আইন নিয়ে তিনি অনেক আলোচনা সভায় যোগ দেন। এই সময় উপাচার্য ছিলেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। তিনি রসুলকে আইন বিষয়ে অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত করেন। কিন্তু লর্ড কার্জন তাঁর নিয়োগ বাতিল করে দেন। এর প্রধান কারণ, আব্দুল রসুল তখন বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে পরিচিত মুখ। বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গড়ে ওঠে বঙ্গীয় শিক্ষা পরিষদ। তরুণ বিপ্লবীরা এই সংগঠনের উদ্যোক্তা। আব্দুল রসুল তার অন্যতম সংগঠক। তিনি ১৯১৩-১৬ সাল পর্যন্ত এই সংগঠনের সম্পাদক ছিলেন। উল্লেখ্য, এই সংগঠনেরই অভিক্ষেপ আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

আব্দুল রসুল সফল আইনজীবী ছিলেন। দুঃস্থ কৃষকদের পক্ষ নিয়ে বারবার সওয়াল করতেন। এর জন্য কোনো ফিজ নিতেন না। একবার এক খ্রিস্টান পাদরি হজরত মহম্মদ (স.) কে নিয়ে একটি কুৎসিত প্রবন্ধ লেখেন। মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক আকরম খাঁ তার বিরুদ্ধে মামলা করলে রসুল সাহেব তাঁর হয়ে এই মামলা জেতেন। এরপর খাঁ সাহেব তাঁকে ফিজ-এর কথা বললে তিনি বলেন, 'ইসলামের প্রতি তার কি কোন কর্তব্য নাই?'

আলিপুর বোমা মামলা ছিল প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রী অরবিন্দ ঘোষের প্রতি সাজানো একটি মামলা। শ্রী অরবিন্দের পক্ষে এই মামলায় আইনজীবী ছিলেন দু'জন—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ এবং আব্দুল রসুল। প্রথম নামটির প্রতি ইতিহাস সুবিচার করলেও দ্বিতীয় নামটির ক্ষেত্রে তা করা হয়নি।

প্রখর ব্যক্তিত্বের অধিকারী আব্দুল রসুল ছিলেন অমায়িক ও বন্ধু বৎসল। ইংল্যান্ডে থাকার সময়ই তাঁর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের পরিচয় এবং ঘনিষ্ঠতা হয়। তাঁর প্রভাবেই তিনি ঠিক করেন দেশে ফিরে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দেবেন। সেইসূত্রে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হয়ে ওঠেন! ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গে-র সক্রিয় বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশ। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অগ্রদূত রসুল সভা-সমিতিতে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করতেন। বিরাট অসংখ্য মানুষকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনে শামিল করেন তিনি। জাতীয় স্বার্থের অনুকূল কর্মধারায় তিনি যেমন এম এ জিন্নাহ ও ফজলুল হকের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন তেমনই মুসলিম লীগের কর্মসূচিতেও যোগ দিয়েছেন। রসুল সাহেবের বক্তব্য যেমন অনেক মুসলমানকে রুষ্ট করেছিল তেমনি সলিমুল্লাহ-গজনভী-সোহরাবর্দী, এমনকী জিন্নাহ সাহেবের শ্রদ্ধার্ঘও তিনি লাভ করেছিলেন।

১৯১৬ সালের ২৪ এপ্রিল, বর্ধমানে মুসলিম লীগের সম্মেলনে সভাপতির আসন থেকে রসুল বলেন "আমি সব সময় বলে আসছি যে ভারত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মাতৃভূমি। তাই উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টার মধ্যে এর কল্যাণ ও মুক্তি নিহিত।" আব্দুল রসুল চাইতেন, মুসলমানরা বেশি বেশি করে ভারতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করুক। তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেন। চট্টগ্রামের মুসলিম আসন থেকে বিপুল ভোটে জিতে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন। তিনি সাম্প্রদায়িক রাজনীতিকে সমর্থন করেননি কোনোদিনই। সমন্বয়বাদী-জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁর আদর্শ।

১৯১৭ সালের ৩১ জুলাই মাত্র ৪৩ বছর বয়সে রসুল সাহেব মৃত্যুবরণ করেন। ওইদিন ওয়েলেসলি স্কোয়ারে জানাজা অন্তে বাগমারী কবরখানায় তাঁকে দাফন করা হয়। শহরের সম্ভ্রান্ত সব মানুষ শেষ বিদায় জানাতে উপস্থিত হন। জানাজার পর যখন কবরস্থানের দিকে যাওয়া হচ্ছিল তখন স্যর রাসবিহারী ঘোষ ছুটতে ছুটতে এসে লাশবাহী একজনকে সরিয়ে দিয়ে বলেন : ওঁর লাশটা আমাকে খানিকক্ষণ বইতে দাও ভাই, ইনি যে আমাদের সবার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

কলকাতায় রয়েড স্ট্রিটে ছিল তাঁর বাড়ি। সেটা এখন সন্ধানহীন হয়ে গেছে। বাড়িটার মতোই পরিণতি হতে চলেছে মালিকেরও। আমাদের অধিকাংশজনের চেতন-মনে ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল আর সেভাবে ছায়াপাত করেন না। এটা বিরাট ক্ষতি। এমন ক্ষতির পথে কাঁটা বিছানোর লক্ষ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস।

উইঘুর সমস্যা ও ট্রাম্পের ভূমিকা প্রসঙ্গে

মুসা আলি

উইঘুর মুসলিমদের উপর চিনা অত্যাচারের প্রেক্ষিতে সম্প্রতি চোখের জলে বুক ভাসিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোলান ট্রাম্প। এ বিষয়ে বিশ্বজুড়ে জনমত তৈরির লক্ষ্যে ইতিমধ্যে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তিনি। মার্কিন কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিল। পরিস্থিতির উপর নজর রাখতে রাখতে আমরা কেউ কেউ ভিতরে ভিতরে বেশ একটু উৎসাহিত হচ্ছি! এতদিনে যদি উইঘুরদের অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন হয়।

প্রায় চার হাজার বছর আগে থেকে উইঘুর জাতির মানুষ স্বাধীন পূর্ব তুর্কিস্থানের অধিবাসী। তারা প্রাচীন সিল্ক রোডের পাশে বসবাসকারী এশিয়ার এক সুপ্রাচীন জনজাতি। তাদের চারপাশে চীন, ভারত, পাকিস্তান, কাজাখাস্তান, মঙ্গোলিয়া এবং রাশিয়ার অবস্থান। ২০০৯ সালের হিসাব অনুসারে চীনের জিনজিয়াংয়ে এক কোটি কুড়ি লক্ষের মতো উইঘুর বসবাস ছিল। এই প্রসঙ্গে অন্যান্য দেশে উইঘুর জনজাতির অবস্থানগত পরিসংখ্যান জেনে নেওয়া যেতে পারে। কাজাখাস্থানে দু লক্ষ তেইশ হাজার, উজবেকিস্থানে পঞ্চান্ন হাজার, কিরগিজস্থানে উনপঞ্চাশ হাজার, তুরস্কে উনিশ হাজার, রাশিয়ায় চার হাজার এবং ইউক্রেনে এক হাজার।

১৯১১ সালে প্রথম মাঞ্চু সাম্রাজ্য উৎখাত করে চীনা শাসন চালু করা হয়েছিল জিনজিয়াংয়ে। কিন্তু স্বাধীন চিত্ত বীর উইঘুররা সেই শাসন বিনা বাধায় মেনে নেয়নি। ১৯৩৩ এবং ১৯৪৪ সালে দু'দুবার চীনাদের পরাজিত করে নতুন করে স্বাধীনতা লাভ করেছিল তারা। কিন্তু ১৯৪৯ সালে চীনা কমিউনিস্টদের হাতে পরাজিত হবার পর আর উইঘুররা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি। যে জিনজিয়াং প্রদেশ উইঘুরদের মূল আবাসভূমি এখন সেখানকার মোট জনসংখ্যা দু' কোটি কুড়ি লক্ষ। তার মধ্যে উইঘুর মুসলমানদের সংখ্যা এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ; অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার প্রায় আটান্ন শতাংশ।

প্রজাতান্ত্রিক চীনের কমিউনিস্ট শাসকরা ভালো করেই জানেন যে, উইঘুর জাতির মধ্যে যে স্বাধীনচেতা মনোভাব দানা বেঁধেছে, তাদের মনের গভীরে ধর্মীয় আনুগত্যের যে আস্তরণ পড়েছে তা দূর করতে গেলে নির্মম নিপীড়ন চালানো ছাড়া আর কোনো পথ নেই। সেই অনুসারে আজও চলছে উইঘুরদের উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার। তথ্যগুলো জানলে বিস্মিত হতেই হবে। দাড়ি রাখা নিয়ে উইঘুরদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। রমজান মাসে রোজা রাখাকে ধর্মীয় চরমপন্থা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে। জাতিসংঘের একটি রিপোর্টে প্রকাশ পেয়েছে, দশ লাখের মতো উইঘুর মুসলিমকে সরিয়ে নিয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং অঞ্চলের বন্দি শিবিরে আটকে রাখা হয়েছে। এখানে বন্দিদের এমন করে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যাতে করে তারা নিজস্ব ধর্মবোধ ও সংস্কৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত হয়। জিনজিয়াং এ যাতে উইঘুররা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয় সেজন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে চীনা হান জাতির মানুষকে সেখানে নিয়ে গিয়ে বসতি তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। মানবাধিকার কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, ছাব্বিশটি স্পর্শকাতর দেশে আত্মীয়স্বজন রয়েছে, এমন উইঘুরদের বিশেষ করে শিবিরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। মূল উদ্দেশ্য, অমানবিক অত্যাচারের চালচিত্র প্রকাশ্যে আসার পথ যথাসম্ভব বন্ধুর করা। মেসেজিং বা হোয়াটস্ অ্যাপের মাধ্যমে যেসব উইঘুর বিদেশে কারুর কারোর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে টার্গেট করে তাদের উপর সীমাহীন অত্যাচারের খাঁড়া নামিয়ে আনা হচ্ছে। উইঘুররা যাতে তাদের নিজস্ব ভাষা বিস্মৃত হয়ে চীনা মান্তারিন ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে ওঠে তার জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা করা হয়েছে। নির্দেশনামা প্রচারিত হয়েছে, দেশের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনে এতটুকু ঘাটতি থাকলে কঠোরতম শাস্তি পেতে হবে। শিবিরে বন্দি উইঘুরদের প্রতি সোজাসাপটা নির্দেশ রয়েছে, দ্বিধাহীন ভাষায় প্রকাশ্যভাবে ইসলামের সমালোচনা করতে হবে। রাষ্ট্রপক্ষ চাইছে উইঘুররা সম্পূর্ণভাবে ইসলাম পরিত্যাগ করুক। এক্ষেত্রে ওমির নামে এক বন্দির জবানবন্দি এইরকম : রাতে ঘুমাতে দেওয়া হয় না, ঝুলিয়ে রেখে বেদম পেটানো হয়, শরীরে সূঁচ ফুটিয়ে যন্ত্রণা দেওয়া হয়, এমন কী, নোখ উপড়ে নিয়ে অত্যাচারের ব্যবস্থাও করা হয়।

এই নির্মম অত্যাচারের প্রেক্ষিতে যে কোনো উদ্যোগকে স্বাগত জানানো যেতেই পারে। মার্কিন রাষ্ট্রনায়কের মতো মহা শক্তিধরের পক্ষ থেকে তেমন উদ্যোগ নেওয়া হলে তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু তবু কথা থেকে যায়। আমেরিকার, বিশেষত বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোলান ট্রাম্পের মুসলিম প্রীতির পক্ষে বাজি ধরা আর নিজেকে মূর্খের সারিতে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করানো একই কথা। তবু কথার প্রেক্ষিতে কথা বলতেই হচ্ছে; করতে হচ্ছে অনেক ভাবনা চিন্তা। মুসলিমদের জন্য এখন পরিস্থিতি মোটেই অনুকূল নয়। এই অবস্থায় যেখান থেকে যা কিছু পাওয়া যায় তা গ্রহণ করতেই হবে। তবে তার আগে অবশ্যই সবদিক খতিয়ে দেখা দরকার। ডোলান ট্রাম্প নামের ওই মিথ্যুকটাকে কিছুতেই বিশ্বাস করা চলে না। মনে রাখতে হবে, করোনা মোকাবিলায় ব্যর্থ রাষ্ট্রনায়কের সারিতে প্রথমেই রয়েছেন এই লোকটা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ জর্জ ফ্রয়েডের অপমৃত্যুর অনুষঙ্গ। এই মুহূর্তে স্বদেশে ট্র্যাম্পের জনপ্রিয়তা একেবারে তলানিতে। এদিকে নভেম্বরে সাধারণ নির্বাচন। এমন অবস্থায় চীনের সঙ্গে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাটা চালিয়ে যাওয়া বড় বেশি দরকার। খুবসম্ভব সে কারণেই ট্রাম্পের এই উইঘুর প্রীতি, অন্যঅর্থে মানবিক আয়োজনের ছদ্মবেশ ধরা। এমন ছদ্মবেশধারী বরাবরই বিপজ্জনক; কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি বিপজ্জনক নয় কি, চিনা কমিউনিস্ট শাসন!

মার্কিনদের মুসলিম বিদ্বেষ আর যাই হোক, একজন ইমানদারের ইমানদারিত্বের পথে আলাদা করে কোনো প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে না। কিন্তু এর বিপরীতে চিনা কমিউনিস্টদের অবস্থান কহতব্য নয়। তারা ধর্ম নামক প্রতিষ্ঠানকে ধূলিসাৎ করে দিতে চায়। ইসলামের প্রতি তাদের বিদ্বেষ অসীমান্তিক। এই অবস্থায় আপাতত শর্তসাপেক্ষে ট্রাম্পের পক্ষে অবস্থান করা যেতে পারে। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে বাণিজ্য যুদ্ধে চীনকে কাবু করার লক্ষ্যে নেওয়া যেতে পারে কার্যকর ভূমিকা। তবে এ সবকিছুই করতে হবে ঐকান্তিক চেতনার ছাঁকুনিতে নিজেদেরকে বারবার ছেঁকে নিয়ে। অবাঞ্ছিত আবেগকে এতটুকুও প্রশ্রয় দেওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে, একরাশ অবাঞ্ছিত আবেগই আজ জাতীয়, সেইসঙ্গে বৈশ্বিক মুসলিম সমাজের পথচলার পথে প্রধান প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যথাসম্ভব নিরাসক্ত মন ও মনের অধিকারী হওয়া ছাড়া এখন আত্মরক্ষা করা দুরূহ। কাজেই বৌদ্ধিক চেতনার সীমানাকে প্রসারিত করা হোক দিগন্ত বরাবর।

সক্রেটিস : হেমলকে লীন হয়েও আজও অমলীন

সামশুল আলম

মুক্তচিন্তা ও যুক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য দর্শনের ভগীরথ সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রি. পূ.)। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো ও প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল; মুখ্যত এই তিন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্ব ধারণ করে রয়েছেন পাশ্চাত্য দর্শনের ভিত্তিকে। সেদিক থেকে দেখলে সক্রেটিসের অনন্যতা অনস্বীকার্য।

সক্রেটিস এর নামে কোনো গ্রন্থ প্রচলিত নেই। খুবসম্ভব তিনি নিজে হাতে একটিও বই লেখেননি। আর এটা তিনি করেছিলেন বিশেষ বোধ ও বোধি থেকে। জীবনের সায়াহ্ণ বেলায় এসে তাঁর মনে হয়েছিল কিছুই তাঁর জানা হয়নি। 'যাঁর কিছুই জানা হয়নি' তিনি উত্তর প্রজন্মের জন্য কিই বা লিখে যেতে পারেন!

৪৬৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ বা এর কাছাকাছি সময়ে এথেন্সের এ্যালোপেকে সক্রেটিসের জন্ম হয়। পিতা সফ্রোনিসকাস একজন ভাস্কর। মা ফায়েনারেট পেশায় ধাত্রী। স্ত্রী জানথিপে। দাম্পত্যজীবন ছিল ভীষণ রকমের অসুখী। দ্বিতীয় একজন স্ত্রীও ছিল। তিন সন্তানের জনক ছিলেন তিনি।

সক্রেটিস একেবারেই দৃষ্টিনন্দনযোগ্য পুরুষ ছিলেন না। ইতিহাসে তাঁর দেহ কুৎসিত বা কদর্য বলে বর্ণিত হয়েছে। এই বর্ণনার উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে যে চিত্র তৈরি করা হয়েছে সেখানে তিনি খর্বকায় স্থূলদেহী চাপানাক পুরুঠোঁট বিশিষ্ট একজন অতি সাধারণ মানুষ। তাঁর পোষাকে আশাকে মালিন্যতার সঙ্গে দৈন্যের ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। নগ্ন পায়ে অথবা জীর্ণ চপ্পল সহযোগে লাঠি হাতে বাজারে ঘুরে বেড়ানো ছিল নিত্যদিনের কাজ।

পিতামাতার উদ্যোগে যথাসময়ে যোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সক্রেটিসের উপযুক্ত শিক্ষার আয়োজন করা হয়। সে সময়ে এথেন্সের প্রথা এবং আইন অনুযায়ী তিনি সামরিক শিক্ষা অর্জন করেন এবং রণাঙ্গনে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাবর্তনের পর শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামরিক দক্ষতা, মেধা এবং বুদ্ধিদীপ্ত বাকপটুতার কারণে এথেন্সের নাগরিক সমাজে তাঁর প্রতিপত্তি তৈরি হয়। অতঃপর তিনি সামরিক জীবন থেকে অবসর নিয়ে শিক্ষা বা জ্ঞানচর্চায় মনোনিবেশ করেন।

শিক্ষকতাকেই জীবনের ব্রত করা হলো। এদিকে শিক্ষকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে পারলেন না কিছুতেই। বিনা মূল্যে চললো জ্ঞান বিতরণ; শিক্ষা দানের ক্ষেত্রেও প্রথাগত ধারাকে মান্যতা দেওয়া হলো না। চলতে চলতে রাস্তায় কিম্বা দোকানে, রেঁস্তোরায় কিম্বা পাবলিক প্লেসে জ্ঞানের ডালি উপুড় করে দিতে থাকেন সক্রেটিস।

তাঁর শিক্ষাদানের মাধ্যম কোনো লম্বা চওড়া ভারী ভারী বক্তৃতা নয়। শিক্ষার্থীর প্রতি একের পর এক প্রশ্ন করে যাওয়া এবং তার উত্তর শিক্ষার্থীর মুখ থেকেই বের করে নেওয়ার নীতিতে ছিল তাঁর প্রগাঢ় বিশ্বাস। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করতেন, যে কোনো প্রশ্নের উত্তর বা সমস্যার সমাধান শিক্ষার্থীর নিজের মধ্যেই নিহিত আছে। তাঁর এই মতামত দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষত যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে। বিদ্বৎসমাজ থেকে রাজপ্রাসাদ, সমাজের সর্বস্তরে তাঁর জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়ভাবে বেড়ে যায়।

সক্রেটিসের দর্শনের মূল চালিকা শক্তি যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে সত্যের অন্বেষণ। ফলে পূর্বসূরিদের প্রচারিত দার্শনিক সত্যের অনেকগুলিই সক্রেটিসীয় প্রশ্নের মুখে দাঁড়ায় এবং তা ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়। 'Socrates argues for certain philosophical position and oppose others'। এই উক্তির দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সেদিনের সেই জীবন-সত্য। তাঁর জীবনভোর সত্যান্বষণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা হয়েছে— "He devotes his life to one question only– how he and others can became good human being or as possible"। অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকেই তিনি তাঁর সারসংক্ষেপ করেন—Virtue is a form of knowledge that care of the soul and the cultivation of virtue is the most important human obligation.

সক্রেটিসের নিজের লেখা কোনো গ্রন্থ নেই। শিষ্যবর্গের দ্বারা লিখিত Dialogue– Apology of Socrates– Republic (প্লেটো) Memorabilia (জেনফোন) Cloud (এ্যারিস্টোফন) প্রভৃতি থেকে ও অ্যারিস্টটলের রচনাদির সূত্রে তাঁর চিন্তা চেতনার পরিচয় পাই আমরা। অবশ্য এই পরিচয় কতখানি নির্ভরযোগ্য তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। প্লেটোর রচনায় সক্রেটিসকে যেভাবে চিত্রিত করা হয়েছে তা সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয়। কোথাও কোথাও গুরুর প্রতি শিষ্যের অতিরিক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন; স্থানে স্থানে নিজের বক্তব্য গুরুর নামে চালিয়ে দেওয়া, এমন নানা অভিযোগ বর্তমান।

সে যাই হোক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও সক্রেটিসকে শেষাবধি তার স্বরূপে চিনে নিতে বিশেষ সমস্যা হয়নি আমাদের। এক্ষেত্রে যে বিষয়টা অত্যন্ত মর্মান্তিক ও সীমাহীন লজ্জাজনক হয়েছে তা হলো, সক্রেটিসের জীবনের পরিণতি। প্রচলিত সত্যকে যুক্তির কষ্ঠিপাথরে বিচার করে দেখা এবং মিথ্যা প্রতিপন্ন হলে তাকে বর্জন করা; এই দর্শনের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত বদহজম হয়েছিল সেদিনের এথেন্সের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর। তারা সক্রেটিসের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ দায়ের করেন। আনীত অভিযোগগুলি ছিল এইরকম-১. প্রচলিত দেবদেবীর প্রতি অবিশ্বাস এবং নিজ দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা। ২. এথেন্সের গণতন্ত্রের প্রতি অবিশ্বাস এবং বিরোধিতা। ৩. যুবসম্প্রদায়কে বিপথে চালিত করা।

এইসব অভিযোগের ভিত্তিতে ৫০১ জন প্রথমশ্রেণির জুঁরির উপস্থিতিতে চলে বিচারের নামে প্রহসন। ২৮০ জন মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে মত দেন। ২২১ জন এর বিরুদ্ধে মত পোষণ করেন। সংখ্যাধিক্যের নিরিখে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার সিদ্ধান্ত হয়।

এথেন্সের আইন অনুসারে অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করা অথবা বিকল্প শাস্তির জন্য আর্জি জানানোর সুযোগ ছিল সক্রেটিসের সামনে। কিন্তু তিনি সেই সুযোগ গ্রহণের প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন এবং অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেকে নির্দোষ বলে ঘোষণা দেন। অতঃপর বিচারকমণ্ডলীর ব্যবস্থাপত্র অনুসারে তীব্র হেমলক পূর্ণ পাত্র স্বহস্তে ওষ্ঠে স্পর্শ করে আনন্দাপ্লুত চিত্তে পরম সত্যলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এই মহান দার্শনিক পুরুষ।

তখন ছিল ৩৯৯ খ্রি. পূ.। তারপর কেটে গেছে অনেকটা সময়। ইতিমধ্যে ইতিহাসের চাকা ঘুরে গেছে একশো আশি ডিগ্রি। সেদিন যে ইউরোপ মুক্তবুদ্ধির পৃষ্ঠপোষক সক্রেটিসকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিল আজ তারাই মুক্তবুদ্ধির ধুঁয়ো তুলে অবশিষ্ট বিশ্বকে চোখ রাঙাচ্ছে।

গ্রন্থ-বীক্ষণ

সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ

বাঙালি মুসলমান সমাজের সামাজিক ইতিহাস বিষয়ে ওপার বাংলা এপার বাংলা মিলিয়ে বেশ কিছু গবেষণামূলক কাজ হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে একাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ। ওইসব গ্রন্থাদির সাপেক্ষে অধ্যাপক স্বপন বসু কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত উনিশ শতকের সংবাদ-সাময়িকপত্রে বাঙালি মুসলমান সমাজ এর বিশেষত্ব সুস্পষ্ট। উনিশ শতকে প্রকাশিত মুসলমান ও অমুসলমান উভয় সমাজের তত্ত্বাবধানে সম্পাদিত বা পরিচালিত প্রায় একশো দশটি পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যার নিবিড় পাঠ নিয়ে তথায় মুদ্রিত মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট সব বিষয়কে সংকলিত করা হয়েছে এখানে। এমন সংকলনের দ্বিতীয় কোনো নিদর্শন আছে বলে আমাদের জানা নেই।

গবেষক নূরউল ইসলাম এর সম্পাদনায় সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত শীর্ষক দুই খণ্ডে বিন্যস্ত রচনার কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণে আসতে পারে। আমরা গ্রন্থ দুটির তুলনামূলক পাঠ নিয়ে দুই এর মধ্যে বিস্তর ব্যবধান লক্ষ করেছি। সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত এর পরিসর তুলনায় সংক্ষিপ্ত। এখানে নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে মুখ্যত সাময়িকপত্রে মুদ্রিত প্রতিবেদন সমূহ সংকলিত হয়েছে। সংবাদপত্রের বিস্তৃত পরিসরের প্রতি সেভাবে নজর দেওয়া হয়নি। এদিকে নাম থেকেই সুস্পষ্ট যে আলোচ্য রচনাটিতে সাময়িকপত্রের পাশাপাশি সংবাদপত্রের উপরেও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। বলা যায়, এখানে স্থানে স্থানে সাময়িকপত্রই মুখ্য স্থান অধিকার করেছে। তা ছাড়া নূরউল ইসলাম সাহেব কেবলমাত্র মুসলমান সমাজ সম্পাদিত নির্দিষ্ট কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ও ওইসব পত্রিকা নির্ভর আরও নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়কে সামনে রেখে তাঁর কাজ করেছেন; কিন্তু স্বপন বসু মহাশয় তেমন কোনো সীমাবদ্ধ পরিসরে নিজেকে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতি সংশ্লিষ্ট যে কোনো বিষয়ের উপর চোখ রাখার চেষ্টা করেছেন। এতে তাঁর রচনায় এসেছে ব্যাপ্তি ও গভীরতা।

একদিকে বিরাট পরিসর, অন্যদিকে অনুপুঙ্খ উপস্থাপন। সহস্র সহস্র শব্দ সম্বলিত সব প্রতিবেদনের পাশাপাশি কয়েকটি মাত্র বাক্যনির্ভর সামান্য প্রতিবেদনও অতি যত্নের সঙ্গে সংকলিত হয়েছে এখানে। এতে গ্রন্থটি হয়ে উঠেছে সমকালীন বাঙালি মুসলমান সমাজেতিহাসের প্রামাণ্য দলিল।

উনিশ শতক বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে প্রবল এক ভাঙা গড়ার যুগ। এই সময় বঙ্গদেশে, বিশেষত শহরাঞ্চলে সমাজ মানসে যে নবচেতনার সঞ্চার হয়েছিল তা হিন্দু সমাজের পাশাপাশি এখানকার মুসলমান সমাজকেও বিশেষভাবে আড়োলিত করেছিল। এদিকে মুসলমান সমাজের এই নবচেতনার বৃত্তান্ত এতকাল ছিল আমাদের কাছে শুধুই কথার কথা। তথ্যাদি সহযোগে বিষয়টিকে প্রতিষ্ঠিত করার মতো উপাদান আমাদের হাতে মজুত ছিল না। এখন সেসব উপাদান হাতের নাগালের মধ্যে চলে এল। হাত বাড়ালেই অনায়াসে এর স্পর্শ ও গন্ধ নেওয়া যাবে। এই প্রাপ্তি যে ঠিক কতখানি বিজ্ঞজন মাত্রেই তা সহজে উলব্ধি করতে পারেন।

ইংরেজি শিক্ষা, নারী শিক্ষা, বাল্য বিবাহ, স্বাধিকারের জন্য সংগ্রাম ইত্যাদি হাজারও সব বিষয়কে ঘিরে সেদিনের বাঙালি মানস আলোড়িত হয়েছিল। এই আলোড়নের উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করা যায় সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ-এর অঙ্গনে পা রাখলে। প্রত্যেকে তার মতো করে ভাবছে; এইসব ভাব-ভাবনাকে কেন্দ্র করে তৈরি হচ্ছে এক একটি দল; প্রত্যেক দলের মুখপত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করছে এক একটি পত্র-পত্রিকা। অতঃপর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাকে ঘিরে প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা। আহমদী ও ইসলাম প্রচারক-এর বিরোধ যেমন। উপভোগ্য এইসব বিরোধের প্রামাণ্য উপস্থাপন রয়েছে গ্রন্থটিতে।

সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ প্রণয়ন করে অধ্যাপক বসু যে বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার ধারায় নূতন মাত্রা সংযোজন করেছেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশমাত্র নেই। সংবাদ-সাময়িকপত্র নির্ভর প্রতিবেদনের সংকলন অবশ্যই এই প্রথম নয়। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীবিনয় ঘোষ ইতিপূর্বে এ পথে অনেকটা দূর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের সে যাত্রা সাংঘাতিক রকমের আংশিকতার দোষে দুষ্ট। বাঙালি মুসলমান সমাজ-সংস্কৃতির কোনো সন্ধান তাঁদের রচনায় নেই। মুসলমান সমাজ সম্পর্কে ন্যূনতম সচেতনতাও তাঁরা দেখাননি। কালগত পরিসরের কারণে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামনে তেমন সুযোগ হয়তো ছিল না। কিন্তু শ্রী ঘোষ চাইলে অনেক কিছু করতে পারতেন। করেননি। তাঁদের এই অপূর্ণতাকে পূর্ণ করার ব্রত নিয়ে পথে নেমেছিলেন অধ্যাপক বসু। তাঁর নিজের কথায়-- 'উনিশ শতকের ইংরেজি-বাংলা পত্রিকার যেসব সংকলন বেরিয়েছে, তাতে বাংলার মুসলমানসমাজ থেকে গেছেন প্রায় উপেক্ষিত। এর কারণ—উনিশ শতকেরপত্রিকা-সম্পাদকদের অধিকাংশ মুসলমান সমাজ সম্পর্কে উদাসীন। ফলে তাঁদের খবর এই সময়ের পত্র-পত্রিকায় কমই বেরিয়েছে। কিন্তু উনিশ শতকের বাঙালিসমাজের পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যাবে মুসলমানদের সুখ-দুঃখ, হতাশা-বঞ্চনার সঠিক ছবিটি না জানলে।' (ভূমিকাংশ) মুক্তবুদ্ধির সঙ্গে গভীর আন্তরিকতার সমন্বয় না ঘটলে উচ্চারণে এমন স্বতঃস্ফূর্ততা আসে না। আর এই স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণেরই বড় অভাব আজ। ক্রমশ যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে আসছে। এমন রুদ্ধশ্বাস অবস্থার মধ্যে অধ্যাপক বসু ও তাঁর সৃষ্টি আমাদেরকে প্রাণিত করে। মনে হয় এখনও সুন্দর করে বাঁচার পক্ষে সব পথ রুদ্ধ হয়ে যায়নি। এক একটা খোলা জানালা দিয়ে আজও উন্মুক্ত বাতাস অবাধে প্রবাহিত হয়; আর সুযোগ রয়েছে সে ঝোড়ো হাওয়ায় নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে অন্য কোনো সত্যলোকে স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার।

সম্পাদক

সংবাদ-সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সমাজ ১০০০/-

স্বপন বসু

বুকস স্পেস, ২ বি/৩, নবীন কুণ্ডু লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর পক্ষে সাইফুল্লা-র সম্পাদনায় মীর রেজাউল করিম কর্তৃক
৩৮, ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত।